প্রতিধ্বনি the Echo
A journal of Humanities & Social Science
Chief Editor: Bishwajit Bhattacahrjee
Published by: Dept. of Bengali
Karimganj College, Karimganj, Assam, India.
Website: www.thecho.in

প্রফুল্ল রায়ের 'ভাতের গন্ধ': প্রতাপ-বিশ্বের অন্তরালে স্পন্দিত জীবন

ড. পারমিতা আচার্য
প্রবক্তা, বিবেকানন্দ জুনিয়র কলেজ, শিলচর, আসাম, ভারত

Life follows its own fragmentary way chequered in light and shade. Embroiled in its own cauldron it reaches the point of vortex when power comes into the fray and raises its ugly head. Bruised and battered, it seems to stumble in its own path. But the milk of the human kindness continues to make its pristine way amidst these changing tides. 'Bhater Gandha' by Prafulla Roy captures this slice of life as it sheds light on the subaltern section in Bihar, living on the edge, their endeavor to clutch at a meaning despite all the existing void. This is a review/ critique of the novel.

প্রতাপের বহির্মুখী এবং অন্তর্মুখী — উভয় অভিঘাতেই চলমান জীবনের ক্ষেত্রে রচিত হয় নীরবতার গভীর পরিসর। ফলে বদলে যেতে থাকে সময়ের আবেদন। বদলে যেতে থাকে জীবন। বদলে যায় জীবনের দর্পণ — সাহিত্যের আদলও। সাহিত্যের প্রতিফলিত প্রতিবিম্বে সেই অন্ধবিন্দুগুলি তখন অনেকটাই পরিস্ফুট হয়ে উঠতে থাকে। আবিস্কৃত হতে থাকে অনেক অনালোকিত পরিসর। আমাদের অভ্যস্ত চেতনায় তখন ধরা পড়ে সমাজদেহের পাঁকে পাঁকে জড়িয়ে থাকা আধিপত্যবাদী অক্টোপাসের সাঁড়াশি চাপ। আমরা বুঝতে পারি আধিপত্যপ্রবণ মানসিকতা শুধুমাত্র প্রশাসনিক ক্ষেত্রেই প্রতাপ বিস্তার করে ক্ষান্ত হয় না, ঊর্ণনাভের মতো সেই প্রতাপকে বিস্তৃত করে দেয় রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক-বৌদ্ধিক পরিসরেও। ইতালিয় কমিউনিস্ট নেতা ও দার্শনিক আন্তেনিও গ্রামশির চিন্তাসূত্র অনুযায়ী,

> "...বুর্জোয়াশ্রেণী কেবল শাসনযন্ত্রে তার প্রভুত্বই প্রতিষ্ঠা করে না, সৃষ্টি করে এক সার্বিক সামাজিক কর্তৃত্ব বা 'হেগেমনি'। ...সংস্কৃতি ও ভাবাদর্শের জগতে এক আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে 'হেগেমনিক' বুর্জোয়াশ্রেণী তার শাসনের নৈতিক ভিত্তি হিসেবে 'সাবলটার্ন' শ্রমিকশ্রেণীর কাছ থেকে সামাজিক সম্মতিও আদায় করে নেয়।" [১]

--বুঝতে অসুবিধা হয় না যে শাসন তথা শোষণের বিচিত্র বিভঙ্গো সমৃদ্ধ এই প্রতাপবিশ্ব।

সমাজ গঠনের ঠিক পর পরই এই শাসক তথা শোষক এবং শোষিত'দের মধ্যে গড়ে উঠে এক ভিন্ন স্তর বিভাজন। বর্ণাশ্রয়ী সমাজ কাঠামোয় যেখানে প্রাধান্য অর্জন করে ব্রাহ্মন সম্প্রদায়, ঋগ্বেদের দশম মন্ডল / নব্বই সূক্ত / একাদশ ও দ্বাদশ ঋক অনুযায়ী যার উৎপত্তি সেই পরম পুরুষের মুখগহ্বর থেকে; সেখানে সমাজের সর্বনিম্নস্তরে স্থান পায় শূদ্র তথা অনার্য তথা ব্রাত্য তথা প্রান্তিকায়িত শ্রেণী, যারা সেই পরম পুরুষের পদদ্বয় থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে 'অদীক্ষিত', 'ঘৃণ্য', বা 'দাস' বলে। সমাজের এক বিশাল সংখ্যক খেটে খাওয়া শ্রেণী এদের অন্তর্ভূক্ত। আর বলাই বাহুল্য যে এই কোণঠাসা করে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুধু বর্ণগত দিক থেকেই নয়, জারি ছিল পেশাগত, বিত্তগত বা অর্থগত, বর্গগত দিক থেকেও।

যাই হোক, সময়ের সঙ্গো সঙ্গো মানবতা-বিরোধী এই প্রথাগুলো কিন্তু তেমন পরিবর্তিত হয় নি। বরং প্রায় একভাবেই, হয়তো একটু ভিন্ন আদলে সমাজে প্রচলিতই রয়ে গেছে। আধিপত্যবাদী বর্গ নিজের

নিরঙ্কুশ ক্ষমতার যাদুছড়িটিকে আরও বেশি নিরাপদ রাখার জন্য এরপরেও এই প্রান্তিকায়িত, মেরুদন্ডহীন বিশাল জনশ্রেণীর অভ্যন্তরে আরেক জটিল রাজনৈতিক অঙ্ক কষে এবং সৃষ্টি করে 'অচ্ছুৎ' বা 'অস্পৃশ্য' বা 'জল-অচল' শ্রেণী! সমাজের অবহেলিত শূদ্রশ্রেণীরও নিম্নপর্যায়ের এক শ্রেণী, যাদের ছুঁলে জাত যায়। যারা স্পর্শেরও অযোগ্য! এমনকি যাদের ছায়া মাড়ানোও পাপ বলে গণ্য হয় এবং,

> "...ব্রাহ্মণ্য বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার মধ্যে এদের কোন স্থান ছিল না।" [২]

লক্ষ করলে দেখব, সবরকম মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত, পদদলিত, সমাজচ্যুত শ্রেণীর এইসব নির্যাতিত মানুষরা প্রাচীন যুগে যেমন ছিল, আজও তেমনই রয়ে গেছে। তাই 'রামায়ণ'-এ যেমন দেখি,

> "রামায়ণে রামচন্দ্রের শম্বুকবধের কারণই হল শম্বুক শূদ্রদের জন্য নির্দিষ্ট ধর্ম পালন না করে বেদচর্চায় রত হয়েছিলেন।" [৩]

তেমনি, আধুনিক ঔপন্যাসিক ভগীরথ মিশ্রের 'আড়কাঠি' (১৯৯৩) উপন্যাসেও দেখি বাঁকুড়া কলেজের অধ্যাপক লোকসংস্কৃতিপ্রেমী রাজীব, ক্ষমতা বিস্তারের ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দী রঙলালকে বলে,

> "অষ্টাদশ শতাব্দীতে তোমরা জঙ্গল টুঁড়ে টুঁড়ে যে স্টাইলে স্লেভ-হান্টিং করেছ, ঠিক সেই পদ্ধতিতে এখানে অবশ্য দাস-শিকার হয় না এখন। পদ্ধতি তোমরাও বদলেছ, আমরাও বদলেছি।" [৪]

--অর্থাৎ মূল বিষয় একই। আমরা দেখে আশ্চর্য হই 'ছন্দের ভিতরে এত অন্ধকার' (শঙ্খ ঘোষ)! প্রাচীন সময় থেকে বর্তমানে আসতে আসতে প্রতাপের কৃৎ-কৌশল অর্জন করেছে বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনা।

কিন্ত আমরা জানি যে, ক্ষমতায়নের প্রভাবে আক্রান্ত হলেও জীবনের সীমাহীন রহস্য-এষণায় সাহিত্যের অসীম পরিধি কোনো নির্দিষ্ট ঘেরাটোপে বন্দী থাকতে পারে না। সাহিত্য স্বভাবতই শাশ্বত-গতিশীল। এবং দ্বিবাচনিক। তাই, প্রতাপের মায়াজাল সামাজিক-সাংস্কৃতিক-বৌদ্ধিক -- সমস্ত স্তরেই চেতনাবিলোপকারী প্রভাব বিস্তার করলেও, সাহিত্য সেই জাল ছিন্ন করে বেরিয়ে আসেই। ঔপনিবেশিক চেতনার বিপরীতে উপনিবেশোত্তর চেতনায় তাই ঋদ্ধ হয়ে উঠে সাহিত্য। এর সীমানা দ্রুত বিস্তৃত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে বহুদূর পর্যন্ত যেখানে আধিপত্যবাদী চেতনার বিপরীতে ধীরে ধীরে জেগে উঠে নিম্নবর্গীয় চেতনা।

এই দিকটিতে আলাদাভাবে আলোকপাত করলে দেখব বাংলা সাহিত্যের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে শুরু থেকেই নিম্নবর্গীয় জনসাধারণের মিলিত উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। যদিও সে উপস্থিতি একাধিপত্যের কাঠামোকে বিদ্রোহ জানিয়ে নয়। তবুও ধর্মীয় বাতাবরণের মধ্যে হলেও, বিশাল গণজীবনের এক নিখুঁত সার্বিক চিত্রাঙ্কণ আমরা 'চর্যাপদে'র মধ্যে খুঁজে পাই। আর মধ্যযুগের সাহিত্যে তো মূলত নিম্নবর্গের মানুষদের জীবনাচরণ ধর্মের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে অনেকটাই স্পষ্ট হয়ে উঠে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র পর্ব থেকে মঙ্গালকাব্যের দীর্ঘ পথ পরিক্রমা করে চৈতন্যদেবের 'মানবধর্মে' অভিষিক্ত হয়ে লোকসাহিত্যের সপ্তরঙা জীবনের বৈচিত্রে ঋদ্ধ হয়ে সময় ও সমাজের অনিবার্য পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাঁক ফেরাতে ফেরাতে আধুনিককালের কাব্য-নাটক-গল্প-উপন্যাসে নিম্নবর্গীয় জীবন অজস্র বিনির্মাণ ও পুনর্নির্মাণের পালা অতিক্রম করে আসে। আজ আধুনিক জীবনের জটিল সময় ও সমাজের প্রেক্ষিতে ব্রাত্যজনের উচ্চারণ আধিপত্যবিরোধি দৃঢ় প্রত্যয়ে ঝলসে উঠে সদর্পে।

আমরা দেখি, ঔপনিবেশিক ভারতে প্রাক্-স্বাধীনতাপর্বের সাহিত্যে নিম্নবর্গের উপস্থিতি যতটা সোচ্চার, স্বাধীনতা-উত্তর সময়পর্বে তা আরও প্রবল হয়ে উঠে। করালী ('হাঁসুলি বাঁকের উপকথা', ১৯৪৭), ঢোঁড়াই ('ঢোঁড়াই চরিত মানস', ১৯৪৯-৫১), লখীন্দর ('লখীন্দর দিগার', ১৯৫০), শবলা-পিঙলা ('নাগিনী কন্যার কাহিনী', ১৯৫১), মালোদের বাস্তব জীবন ('তিতাস একটি নদীর নাম', ১৯৫৬), নিবারণ মালো / বিলাস ('গঙ্গা', ১৯৫৭), দাশু ঘরামি ('শতকিয়া', ১৯৫৮), মধু কেদার ('জগদ্দল', ১৯৬৬), বন্দ্যঘটি গাঞি ('কবি বন্দ্যঘটি গাঞির জীবন ও মৃত্যু', ১৯৬৭), বীরসা ('অরণ্যের অধিকার', ১৯৭৭), ধর্মা ('আকাশের নীচে মানুষ', ১৯৮১) — প্রমুখদের মতো অজস্র চরিত্র/প্রান্তিকায়িত সম্প্রদায় নিম্নবর্গীয় পরিসর থেকে সরাসরি উঠে আসে

পাদপ্রদীপের আলোয়। অন্তর্বদলের জোয়ার খেলে যায় সময়ের খাঁজে খাঁজে।

এরই মাঝখানে ঘটে যায় নকশাল আন্দোলন। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বিপ্লবের উত্তাল ঢেউয়ে বদলে যায় সময় ও সমাজের দ্বিবাচনিক পটভূমি। যেখানে জীবন অর্জন করে নতুন চেতনা।

আলোচ্য প্রবন্ধে স্বাধীনতা পরবর্তী ঔপন্যাসিক প্রফুল্ল রায়ের 'ভাতের গন্ধ' (১৯৮১) উপন্যাসে বিহারের কঠোর জাতিভেদ প্রথা লাঞ্ছিত সমাজ পটভূমিতে নিম্নবর্গের উত্থানের বিষয়টিতে আমরা আলোকপাত করার চেষ্টা করব।

এক্ষেত্রে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে উনিশ শতক থেকে বাংলা সাহিত্যে তথা উপন্যাসেও আমরা একটি সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপট ধীরে ধীরে ফুটে উঠতে দেখি। তারই ফলশ্রুতিতে, নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলভিত্তিক এলাকাকে কিছুটা বিস্তৃতভাবে এনে বাংলা উপন্যাসের পরিসরকে আরও একটু বাড়িয়ে দিতে দেখি সেই সময়ের অন্যান্য ঔপন্যাসিকদের রচনাতেও। যার উদাহরণ হিসেবে আমরা বিশেষ করে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৮-১৯৭১) 'ধাত্রীদেবতা' (১৯৩৯), 'গণদেবতা' (১৯৪২), 'আরোগ্য নিকেতন' (১৯৫৩) প্রভৃতি উপন্যাসের কথা মনে করতে পারি। তাই বাংলার পাশাপাশি বিহারের লোকজীবনের স্বরূপও আমরা খুঁজে পাই এই সময়ের অনেক ঔপন্যাসিকদের মধ্যে। যেমন, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৩-১৯৪৯), প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩-১৯৩১), শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৮-১৯৩৮), শশিশেখর বসু (১৮৭৪-১৯৫৪), পরশুরাম (১৮৮০-১৯৬০), বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০) প্রমুখ। এই ধারাই পরবর্তীতে আরও বেশি বিস্তৃত হয়ে যায় বনফুল (১৮৯৯-১৯৭৯), সতীনাথ ভাদুড়ীর (১৯০৬-১৯৬৫) উপন্যাসে। কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যন্ত প্রায় সকলের উপন্যাসেই বিহারের প্রান্তিকায়িতবর্গের শোষিত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, দারিদ্রপূর্ণ জীবনের চিত্র ফুটে উঠলেও, মনুষ্যত্বের গভীর অপমান ও জীবনের করুণ অসহায়তা ততটা নির্মম ও তীব্রভাবে ফুটে উঠেনি; পরবর্তীতে যা কিছুটা সুবোধ ঘোষ (১৯০৯-১৯৮০), শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭০) এবং বিশেষ করে বনফুল ও সতীনাথ ভাদুড়ীর গল্প-উপন্যাসে ফুটে উঠেছে। এই ধারাকেই আরও পুষ্ট, বলিষ্ঠভাবে আকার দান করলেন এবং সময়োপযোগি করে তুললেন স্বাধীনতা পরবর্তী দশকের কথাসাহিত্যিকরা, যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন প্রফুল্ল রায়।

বর্ণ-বর্গ বিভাজিত সামন্ততান্ত্রিক আবহে লালিত বিহারের সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে অধ্যাপক এ. কে. লাল বলেছেন,

> "Bihar tends to be the most unfortunate repository of the brutalities of the caste system." [৫]

জাতপাতের তীব্র ভেদাভেদ বিহারের আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এত ভয়ঙ্করভাবে জাঁকিয়ে বসা যে একটা বিরাট সংখ্যক জনসমাজকে শুধুমাত্র 'অস্পৃশ্য' তকমা দিয়ে স্বাভাবিক জীবন যাপনের অধিকার থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে। বেগার খাটার প্রথা সেখানে একটি সাধারণ নিয়মে প্রচলিত হয়েছে। স্বাধীনতার তিন দশক পরেও যে এই অবস্থার বিন্দুমাত্র হেরফের ঘটে না, বরং তা আরও জটিল ও সূক্ষ্মরূপ ধারণ করে তারই প্রমাণ পাওয়া যায় প্রফুল্ল রায়ের বিহারজীবনকেন্দ্রিক উপন্যাস ও গল্পগুলোর মধ্যে।

বিচিত্রমুখী জীবনকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে গিয়ে প্রান্তিকায়িতদের বাস্তব জীবনচিত্রটিকে নিপুণ আবিস্কারকের মতো তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং ফুটিয়ে তুলেছেন উপন্যাসে। সেই পর্যবেক্ষণেরই ফসল হিসেবে যখন বেরিয়ে আসে, স্বাধীনতার তিরিশটির দশক কেটে যাওয়ার পরেও শুধুমাত্র একটু ভাত — 'ভাতের গন্ধ' (১৯৮১) নেওয়ার জন্য মানুষের অমানুষিক পরিশ্রম — অবশ্যই 'অচ্ছুৎ' হওয়ার অপরাধে — তখন লেখকের সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠি আমরাও। মুহূর্তে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, এই কি স্বাধীন ভারত?

উপন্যাসের নায়কের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে এভাবে,

"ধানোয়ার জাতে গঞ্জু অর্থাৎ জল-অচল অচ্ছুৎ।..."তবে ধানোয়ার স্বাধীন মানুষ।"(পৃঃ ১১)

'অচ্ছুৎ', অথচ 'স্বাধীন' ধানোয়ারের প্রেক্ষাপটটির দিকে একটু তাকালে দেখি, বিহারের পটভূমিতে রক্ষণশীল প্রথানুগামী সামাজিক আবহে জমিমালিকদের অধীনে ধানোয়ারের পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ অর্থাৎ বংশানুক্রমিকভাবে তাঁর আগের চার-পাঁচ পুরুষ 'ভূমিদাস' হলেও, এই বংশানুক্রমিক ধারাবাহিকতা থেকে সে আলাদা হয়ে বেরিয়ে আসে। সে কারো জমিতে 'বেগার' দেয় না। সে উপন্যাসে হাজির হয় প্রতাপের প্রভাবকে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করেই। তাই সে 'স্বাধীন'।

অর্থাৎ আমরা বলতে পারি উপন্যাসের শুরুই হয় নিম্নবর্গীয় চেতনাকে ধারণ করে।

কিন্তু, 'স্বাধীন' হলেও এখন অনিশ্চিত হয়ে যায় তার ক্ষুধার অন্ন। আর এখান থেকেই শুরু হয় ধানোয়ারের যাত্রা —- অন্নের সংস্থানে, খাদ্যের সংস্থানে। অর্থাৎ যে 'স্বাধীন' জীবন যাপন করতে গিয়ে তাঁর ক্ষুধার অন্ন অনিশ্চিত হয়ে পড়ে, সেই অন্নের খোঁজই এবার তাঁর জীবনকে অনিশ্চিত করে তোলে। খাদ্যের সন্ধানই তাঁর জীবনের একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান হয়ে উঠে। 'আজ কোনো হাটের চালায়, কাল কোনো গাছের নিচে, পরশু হয়ত কারুর বাড়ির বারান্দায়। তরশু বা নরশু সড়কের ধারের খোলা মাঠে। জীবন এইভাবেই কেটে যাচ্ছে তার' (পৃঃ ১১-১২) এবং ঠিক এইভাবে কেটে যাওয়ার ফলেই তার সম্পর্কে লেখক কথিত দ্বিতীয় পরিচয়টি ছাপিয়ে ধীরে ধীরে প্রকট হয়ে উঠে প্রথম পরিচয়টি। আর, আমাদের চোখের সামনে ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠে প্রান্তিকায়িতদের জীবনের প্রকৃত বাস্তব ছবিটি; যার অনেক গভীর পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকে শোষণের রাজনীতির অদৃশ্য দীর্ঘ কালো হাত।

এই অন্ধকারের ঘনত্বকে আরও একটু ফুটিয়ে তুলতেই এরপর পাঠকৃতিতে ক্রমে ক্রমে আবির্ভাব ঘটে কখনো পঞ্চাশ-ষাট জনের , তো কখনো বিশ-ত্রিশ জনের তিন-চারটি দল —- যাদের সবাই 'অচ্ছুৎ' এবং যারা ধানোয়ারের মতোই পথযাত্রী — খাদ্যান্বেষণের। এই সমস্ত অস্পৃষ্য মানুষের দল কেউ বিশ দিন, কেউ দশ দিন, কেউ সাত দিনের পথ অতিক্রম করে 'ভাতের খোঁজে দক্ষিণে ধানের রাজ্যে চলেছে' (পৃঃ ১৩) ! সবার উদ্দেশ্য এক -— ভাত খাওয়া। গরম ভাত এদের কাছে স্বপ্নের বস্তু! জমি মালিকদের গোলায় ধান সব কেটে উঠিয়ে নেওয়ার পর যে ধানগুলো জমিতে পড়ে থাকবে ফাঁকে ফোকরে, সেইগুলোই কুড়িয়ে নিতে হবে ফাঁকা মাঠ থেকে। তাই এরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন ধানের জমির পাশে সড়কের ধারে গাছের তলায় অগ্রহায়ন-পৌষের কনকনে শীত উপেক্ষা করে খোলা আকাশের নিচেই দিন পর দিন অপেক্ষা করে যায় কবে সব ধান কাটা শেষ হবে, ওরা মাঠ থেকে ধান তুলে আনবে, তারপর ভাত রান্না হবে, নতুন চালের ভাতের গন্ধ মাতিয়ে তুলবে চারদিক।

সত্য কখনো কখনো কল্পনার চেয়েও আশ্চর্য হয় বটে!

কিন্তু বিহারের সমাজ জীবনে এই অদ্ভুত চিত্র নিখাদ বাস্তব ছাড়া আর কিছুই নয়। আজন্ম এই প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা এবং প্রথা-নিয়মের চাপে নিষ্পেষিত বিহারের প্রান্তিকায়িত বর্গের জীবন নিতান্ত অভ্যস্ত গতানুগতিকতার সঙ্গে দিন কাটিয়ে যায়। প্রফুল্ল রায় এই নিরেট বাস্তবের ভূমিতে দাঁড়িয়েই জীবনের এই নির্বিকার ঊষর রূপকে উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। এই 'নিয়ম' ভাঙার কথা ধানোয়ার'রাও কখনো ভাবতেই পারে না। বরং তারা ধান কাটাইয়ের কাজে জমিমালিকদের সাহায্য করার কথা ভাবে।

ঔপন্যাসিক নিপুণ সমাজবিশ্লেষকের দৃষ্টিতে প্রতাপের গভীরতলসঞ্চারী প্রক্রিয়াকে এখানে ভাঁজে ভাঁজে মেলে ধরেন। তারা যে খেটে-খাওয়া প্রান্তিকায়িতশ্রেণী — এই বোধ যেমন তাদের চেতনায় স্পষ্ট, তেমনি 'অচ্ছুৎ' বা অস্পৃশ্য হওয়ার কারণে সমাজে ঘৃণার পাত্র — একথাও এরা জানে। আর এধরণের পরিস্থিতিতে শুধুমাত্র অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্যই তখন প্রতাপের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা একান্ত অপরিহার্য হয়ে উঠে। কেননা তারা জানে তাদের এই অনিশ্চিত জীবনে শুধুমাত্র ভগবানই নয়,

'রামজি বিষুণজি আউর বড়ে সরকার ভরোসা-' (পৃঃ ২১)।

ক্ষমতার কূটনীতিতে স্বেচ্ছাবন্দী মন ও চেতনায় শুধু ঈশ্বরই সর্বশক্তিমান নয়, প্রতাপও ঈশ্বরের মতোই সর্বশক্তিমানরূপে প্রতিভাত হয়। গ্রামশির ভাষায় এরাই সমাজের 'সাবলটার্ন' শ্রেণী। এদের সঙ্গে শাসকগোষ্ঠীর তুলনা করলে দেখা যায়, মূলত সমাজের মুষ্টিমেয় শ্রেণীর হাতেই (গ্রামশির ভাষায় 'হেগেমনিক' শ্রেণী বা বুর্জোয়া শ্রেণী) কেন্দ্রীভূত হয় ক্ষমতা এবং এক বিশাল সংখ্যক খেটে খাওয়া শ্রমিকশ্রেণীর স্থান হয় ঠিক এদের বিপরীতে, যাদের উপর প্রয়োগ করা হয় এই ক্ষমতা। এই বিশাল জনতাকে সমাজে 'ওরা' / 'অন্ত্যজ' / 'প্রান্তিকায়িত' / 'ব্রাত্যজন' — বলে একপাশে সরিয়ে রাখা হয়। গ্রামশির বক্তব্যে আমরা জেনেছি যে আধিপত্যবাদী রাজনীতির জটিল মারপ্যাঁচের মাধ্যমে 'সংস্কৃতি ও ভাবাদর্শগত' আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে অর্থাৎ সহজ ভাষায় বৌদ্ধিক আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে বুর্জোয়া শ্রেণী প্রান্তিকায়িত শ্রেণীর উপর শাসনের তথা শোষণের 'সামাজিক সম্মতি'টুকু আদায় করে নেয়।

শাসকগোষ্ঠীর পাশে উপন্যাসের প্রান্তিকায়িত কুশীলবদের সামাজিক অবস্থান বা পরিসরকে মনে রেখে প্রতাপের বুনোটটি ছকের আকারে সাজালে দেখব,

ত্রিলোকী সিং
(জাতে রাজপুত ক্ষত্রিয়)
+
ভানচন্দ ঝা
(মৈথিলী বামহন, বয়স ষাট-পঁয়ষট্টি, পিপরিয়া গ্রাম)
+ } ধানোয়ার , রামনৌসেরা লাখপতিয়া, টহলরাম, সোমবারি, রাতুয়া, মঙ্গোরি, ফির্তুলাল, পরসাদী প্রমুখ নির্ভূম হাভাতের দল
বজরঙ্গী সহায়
(কায়াথ, নওলপুর)
+
ঝামরলাল গোয়ার
(যদুবংশীছত্রী, দুধলীগঞ্জ, উপন্যাসে অনুপস্থিত)

--ঔপন্যাসিক সমাজের অভিজাত শ্রেণীর চারটি ভিন্ন ভিন্ন ধারা থেকে এই চারজনকে প্রতিনিধিস্বরূপ উপস্থিত করে আসলে দেখাতে চেয়েছেন যে, ক্ষমতা দখলের ব্যাপারে এদের প্রত্যেকের অর্থাৎ সমাজের প্রতিটি শ্রেণীর মানসিকতাই সমগোত্রীয়। নরমে গরমে, যে ভাবেই হোক, শোষণ করাটাই এদের মূল লক্ষ্য। এই সম্মিলিত শোষণের বলয়ে ঘূর্ণিত হতে হতে ধানোয়ার'দের জীবন যেমন অনিশ্চিত হয়ে পড়ে, চেতনাও বিলুপ্ত হয়ে যায়। বেঁচে থাকার সমস্ত উৎসাহ, উদ্যম ও উদ্দেশ্য নষ্ট হয়ে গিয়ে একমাত্র প্রধান হয়ে উঠে খাদ্যের সংস্থান করা - হয় 'গতরচূরণ খাটুনি খেটে' (পৃঃ ৩৪), নয় জঙ্গালে 'খতরনাক জানবরে'র (পৃঃ ৪২) মোকাবিলা করে। ফলে প্রতাপ অক্ষুণ্ণ থাকে । অক্ষুণ্ণ থাকে ক্ষুধাও। আমাদের মনে পড়ে যায় সেই অবিস্মরণীয় পংক্তিগুলি,

"শব্দের রঙ্ তারা মুছিয়াছে
মানুষের ভাষা তারা মুছিয়াছে
ভালোবাসিবার ভাষা মুছিয়াছে
এবং যথেচ্ছভাবে যাবতীয় রঙ্।" ৬

দার্শনিক গ্রামশির আধিপত্যবাদ বিষয়ক তত্ত্ব আলোচনায় 'একনায়কতন্ত্র' —এর ধারক ও বাহক হয়ে দেখা দেয় এই চরিত্রগুলি। যেখানে প্রতাপ শুধু মালিকানার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, এর জটিল রূপ বিন্যস্ত হয়ে ঢাকা পড়ে ধর্মের কোরকে এবং যার মূল কথা হল,

"এক প্রান্তে ব্রাহ্মণ ও শুচিতা আর অন্য প্রান্তে অচ্ছুৎ ও অশুচিতা।" ৭

-তাই খাদ্যের জন্য হন্যে হয়ে ঘোরা ধানোয়ার'রা যখন মৈথিলী ব্রাহ্মণ ভানচন্দ ঝা'র কাছে কাজের জন্য আর্জি জানাতে আসে, তখন তাদের বক্তব্য শোনার আগেই তিনি

"দাঁতে দাঁত চেপে বলেন, 'কী জাত তোদের?' (পৃঃ ৩৩)

মনুষ্যত্বের অবমাননায় ঝলসে ওঠার বদলে 'জল-অচল অস্পৃশ্য হবার গ্লানিতে ধানোয়াররা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে' (পৃঃ ৩৩) আর,

"ভানচন্দ ঝা এবার বিস্ফোরণের মতো ফেটে পড়েন, 'দারবান জানবরগুলোকে লাথ মেরে মেরে এখান থেকে ভাগাও। শুয়ারকা বচ্চে অচ্ছুতিয়ার পাল!' " (পৃঃ ৩৩)

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সমাজ গঠনের একদম প্রাথমিক পর্যায়ে কোনরকম ভেদাভেদ বা বর্ণবৈষম্যের ব্যাপার ছিল না। কিন্তু, ক্রমে ক্রমে সময় যত এগোতে লাগল বা বলা ভালো সমাজ যত সভ্য হতে থাকল ততই কর্মগত, বর্ণগত, বর্গগত প্রভৃতির উপর ভিত্তি করে সমাজে নানান বিভাজন সৃষ্টি হতে লাগল। সমালোচক রুমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনায়ও আমরা আমাদের বক্তব্যের সমর্থন খুঁজে পাই,

"সম-অধিকারভুক্ত প্রাগৈতিহাসিক জনগোষ্ঠী প্রাক্‌প্রত্নপ্রস্তর যুগ ও মধ্য প্রত্নপ্রস্তর যুগ অতিক্রম করে, নব্য প্রস্তর যুগের শেষ দিকে এসে, জীবনধারণের প্রয়োজনে যখন — চাষ আবাদ ও বিভিন্ন ধাতুর ব্যবহার শিখল, তখন সভ্যতার ভিত্তি স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে, কর্মবিভাজনের মধ্য দিয়ে সামাজিক অসাম্যের ভিত্তি প্রস্তর গাঁথা হল।" [৮]

কালে কালে সময় ও সমাজের দ্বিবাচনিক পটভূমিতে পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই বিভাজন আরও বিস্তৃতভাবে ও গভীরভাবে সমাজদেহে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। প্রাচীন সমাজব্যবস্থা থেকে শুরু করে হাল-আমল পর্যন্ত প্রতাপের ক্ষমতা দখলের রাজনৈতিক খেলা কায়েম ছিল এবং এখনও রয়েছে। এক্ষেত্রে আধিপত্যহীনদের (গ্রামশি কথিত 'subaltern' শ্রেণী, যার বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে 'নিম্নবর্গ' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন রণজিৎ গুহ) চিহ্নিত করতে বাংলার শব্দভান্ডারে কিছু বিশেষ শব্দের সৃষ্টি করা হয়েছে, যা অবজ্ঞাসূচক এবং হীনতাবাচক। আর আমরা তো জানিই, যে শব্দ অর্থাৎ ভাষা অস্তিত্বের তথা চেতনার চিহ্নায়ক; তাই আধিপত্যবাদীদের উচ্চারণে আমরা যখন দেখি,

(ক) হীন অর্থে 'ব্রাত্য' অর্থ 'পতিত', 'সংস্কারহীন', 'ব্রতভ্রষ্ট', 'বর্ণচ্যুত' ও 'বৃত্তিত্যাগী'।

(খ) প্রাচীনকালে 'ব্রাত্য' শব্দটি নানা অর্থে (বিশেষ সম্প্রদায় বা শ্রেণীরূপে) ব্যবহৃত হয়েছে — যেমন 'সাবিত্রীপতিত', 'গণ', 'শ্রমজীবী', 'পতিত ক্ষত্রিয়', 'অন্ত্যজ' বা 'অস্পৃশ্য', 'পতিত'।

--প্রভৃতি অজস্র শব্দের বহুব্যবহার, তখন শুধুমাত্র জাতিগত বা বর্ণগত বা কর্মগত বা বিত্তগত বা ধর্মগত দিক থেকেই নয়, মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকেও সম্পূর্ণ দূরে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে এক অ-মানবিক পরিসরে তাদের নিয়ে আসার কুটিল রাজনৈতিক কৃৎকৌশলটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যেখানে প্রকৃতপক্ষে অস্তিত্বহীনতার বৃত্ত রচিত হয়। শব্দ যেখানে নৈঃশব্দে পরিণত হয়।

এই অস্তিত্বহীনতার ও নৈঃশব্দের পরিসরেই আবর্তিত হতে থাকে 'অচ্ছুৎ' তথা 'অস্পৃশ্য'-দের জীবন। জনজীবনের মূলধারা থেকে যাদের যোজন যোজন দূরত্ব। বর্তমান যুগে একবিংশ শতাব্দীর সময়ে সমাজে বিভিন্ন ভেদাভেদগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক বিভেদটাই সবচেয়ে বেশি প্রকট হয়ে উঠেছে। জল-অচল / জল-চল 'অচ্ছুৎ'দের উপর এর প্রভেদ সম্পর্কে বলতে গিয়ে সমালোচক রুমা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন,

"অর্থনৈতিক অসাম্যের কারণে বঞ্চিত, শোষণ ও স্বার্থপুষ্ট শ্রমিকনীতির জন্য নিপীড়িত, পক্ষপাতদোষে দুষ্ট, বৈষম্যমূলক শাসনব্যবস্থার বলি হয়ে দলিত, ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থার শিকার হয়ে, শিক্ষা ও সভ্যতার আলোক থেকে নির্বাসিত, সর্বোপরি কুসংস্কারগ্রস্ত ধর্মান্ধতার বলি হয়ে অচ্ছুৎ বা অস্পৃশ্য — এই বিচিত্র শ্রেণী মূলস্রোত (main stream of society) থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে।" [৯]

এই 'বিচ্ছিন্ন', অবহেলিত, প্রান্তিকায়িতদের উদ্দেশ্যে একবিংশ শতাব্দীর আশির দশকেও, সভ্যতা যখন অনেক উন্নত এবং মানুষ যখন সভ্যজাতি বলে অহঙ্কার করতে পারে, তখন সমাজের পরিশীলিত ও মার্জিত রুচিসম্পন্ন অভিজাত শ্রেণী সামাজিক প্রতিপত্তির গর্বে গর্বিত হয়ে 'ভূচ্চরের দল', 'গিদ্ধড়ের পাল' (শকুনির পাল), 'হারামজাদকি ছৌয়া', 'জানবরের ছৌয়া', 'চুহার পাল', শুয়ারকা বচ্চে', 'অচ্ছুতিয়ার পাল' — প্রভৃতি বিশেষণ প্রয়োগ করে।

কিন্তু ধানোয়ার বা আর কারোর কাছেই এ সমস্ত সম্বোধন অপমানকর বলে মনে হয় না। যাই হোক, যেহেতু, উপন্যাসের

> "...প্রতিটি প্রধান অপ্রধান চরিত্র নিছক ব্যক্তি নয়, সময়স্পন্দিত সামাজিক পরিসরের চিহ্নায়ক" [১০]

--তাই এদের মধ্য দিয়ে প্রতাপের প্রবল জাড্যতায় আচ্ছন্ন সমাজে সময়ের গভীর কৃষ্ণবিবরকে ফুটিয়ে তুলতে ঔপন্যাসিক অবতারণা করেন পরসাদী ও লাখপতিয়ার চুরি করে মাঠ থেকে ধান নিয়ে আসার নৈশ-অভিযানকে।

প্রতাপের বিকৃত-বীভৎস রূপ দাঁত-নখ মেলে হিংস্রভাবে আত্মপ্রকাশ করে, যখন দেখি, পরসাদী ও লাখপতিয়া যথাক্রমে নিজেদের ক্ষুধার্ত সন্তান ও শাশুড়ীকে ভাত খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মধ্য রাতে মাঠ থেকে লুকিয়ে ধান আনতে যায় এবং পাহারাদারদের হাতে ধরা পড়ে; মেয়েমানুষ বলে পাহারাদার'রা তাদের মারপিট করে না বটে, শুধু

> "...টান মেরে কাঁথা কম্বল আর পরণের কাপড় খুলে লাখপতিয়া এবং পরসাদীকে পুরো উলঙ্গ করে দেয়।" (পৃঃ ৮০)

এবং,

> "অন্য পাহারাদাররা খ্যাল খ্যাল করে হাসতে হাসতে পৌষের নির্জন ঘুমন্ত প্রান্তরে হিমার্ত বাতাসকে বিষাক্ত করে তোলে।" (পৃঃ ৮০)

বলা বাহুল্য, প্রতাপের নিয়ন্ত্রণাধীন যে সমাজে মনুষ্যত্বেরই কোন স্থান নেই, সেখানে নারীর মর্যাদা শুধুমাত্র পণ্যরূপেই স্বীকৃত!

অবচেতনে প্রতাপের গভীরতলসঞ্চারী প্রক্রিয়া যে কতটা জোরালো ছাপ রেখে যায় এবং অবরুদ্ধ করে দেয় চেতনার বিকাশকে অথবা কতদূর অসহায় করে তোলে সত্তাকে ক্ষমতার দুর্নিবার চাপের সম্মুখে, তা বুঝতে পারি, এদের এই অবস্থা দেখেও রামনৌসেরা ও ধানোয়ার থেকে শুরু করে সবাই পাহারাদারদের হাতে-পায়ে ধরে শুধু কাকুতি-মিনতি করতে থাকে যেন তাদের এখান থেকে তাড়িয়ে না দেওয়া হয়। সবাই কথা দেয় 'সমস্ত ফসল ওঠার আগে কেউ আর জমিতে নামবে না'(পৃঃ ৮০)।

সমাজের প্রগতিশীল ও শুদ্ধাচারী অভিজাতশ্রেণীর স্বচ্ছল ও পবিত্র জীবনের কঠোর নিয়ম-কানুনের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে জীবনদেবতা অসহনীয় মর্মযন্ত্রণায় গুমরে মরে, তাঁর 'চোখ থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় জল ঝরতে থাকে' (পৃঃ ৮১)! আর লাখপতিয়া / পরসাদীর অসাড় হৃদয় থেকে যেন অনুচ্চারিত গুঞ্জন ভেসে আসে,

> "পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ, রক্তে জল ছলছল করে
> নৌকোর গলুই ভেঙে উঠে আসে কৃষ্ণা প্রতিপদ
> জলজ গুল্মের ভারে ভরে আছে সমস্ত শরীর
> আমার অতীত নেই, ভবিষ্যৎও নেই কোনোখানে।" [১১]

--একমুঠো ভাতের মূল্য নির্ধারিত হয় এইভাবে!

আসলে সমাজে নারীর স্থান যেখানে এমনিতেই প্রান্তিকায়িত, সেখানে অস্পৃশ্য নারীর জীবন যে এক অদ্ভুত নিরালম্ব স্থানে এসে দাঁড়ায়, সেই সত্যকেই আসলে অনাবৃতভাবে প্রকাশ করেন ঔপন্যাসিক। শোষণ, অত্যাচার, অপমানের সীমাহীন অতল অন্ধকার এবং প্রতাপের দুর্দমনীয় উন্মত্ততায় কী ভয়ঙ্করভাবে ধ্বংস হয়ে যায় সমস্ত মানবিক চেতনা! কী বীভৎস ও বিকৃত হয়ে ওঠে সময়ের অভিব্যক্তি! ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়ে গেলেও সে স্বাধীনতার আলো যে একেবারে তৃণমূল স্তর পর্যন্ত মোটেই পৌঁছায় নি, বরং সেখানে অটল-অবিচল হয়ে আছে এবং হয়ে থাকে ঔপনিবেশিক শাসনের মরণথাবা, সময় ও সমাজের দ্বিবাচনিক গ্রন্থনায় প্রফুল্ল রায়ের বিহারকেন্দ্রিক উপন্যাসগুলোর মধ্য দিয়ে এই বাস্তবটুকুই স্পষ্টভাবে ফুটে উঠে।

এই সমাজ কাঠামোর ছকের মধ্যে তাই খাদ্যের খোঁজে যে লছমনকে বাঘের মুখে বেঘোরে প্রাণ হারাতে হবে, এ তো বলাই বাহুল্য। এভাবে পথের ধারে ধানক্ষেতের সামনে ভাতের প্রতীক্ষায় থাকা ধানোয়ারদের সংগ্রামমুখর দিনগুলির বর্ণনাকে সপ্তম পরিচ্ছেদ থেকে ধরলে সতের পরিচ্ছেদের সুদীর্ঘ বিস্তারে আমরা দেখি, বিহারের 'অচ্ছুৎ'দের প্রতাপের যূপকাষ্ঠে নিঃশেষ হয়ে যাওয়া গ্লানিময় জীবনের নিদারুণ রূপচিত্রণ। বিহারের লোকজীবনে একেবারে নিচের

স্তরের মানুষদের খাদ্যের জন্য এই করুণ আর্তিকে ঔপন্যাসিক উপন্যাসের সঙ্গে সঙ্গে অনেক ছোটগল্পেও চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। যার মধ্যে 'ভোজ' গল্পটি অসাধারণ। বাস্তব অভিজ্ঞতার যে চিত্র গল্প বা উপন্যাসের মাধ্যমে উপস্থাপিত করেন লেখক, তার পেছনে ভেসে উঠে বিহারের দারিদ্রক্লিষ্ট ধূলিমলিন জীবনের রেখাচিত্রটি।

আর এর নেপথ্যে জোরালোভাবে ফুটে উঠে শাসক শ্রেণীর অঙ্গুলিহেলনে সমাজজীবনে অর্থনৈতিক পরিসেবার তীব্র বৈষম্যের জটিল নকশা। সমালোচক বিন্দেশ্বর রামের ভাষ্য অনুযায়ী যার মূল চাবিকাঠিটি হল,

> '...the key is the overall control of production by a segment of society the upper castes." [১২]

--এই চাপ থেকে সহজে বেরিয়ে আসা সম্ভব হয়ে উঠে না এদের পক্ষে। তাই জমি থেকে সব ধান তুলে নেওয়ার পর যখন ফাঁকা মাঠের দিকে তাকিয়ে জমিদারদের পহেলবানেরা তাদের বলে যে এবার থেকে জমির মালিক তারা, তখন ধানোয়ার'রা এতদিন পর ধান কুড়িয়ে এনে ভাত খেতে পারবে বলে আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠে। ঔপনিবেশিক আকল্পের শক্ত বাঁধনে, অভ্যস্ত বঞ্চিত জীবনের ঘেরাটোপ ভেঙে মুক্তির প্রথম পদক্ষেপের ধ্বনি আর শোনা যায় না। বরং,

> ''আদিগন্ত ফাঁকা মাঠের ভেতর হাঁটতে হাঁটতে আকাশে দু'হাত ছড়িয়ে খুশিতে চেঁচিয়ে ওঠে টহলরাম, 'হামনিলোগ জমিনকা রাজা বন গিয়া।' " (পৃঃ ৮৫)

অবশেষে, শুরু হয় ধান কুড়োনো।

ঔপনিবেশিক ভাবাদর্শের প্রবল বিষে জর্জরিত সমাজে কোথাও কোন আলোড়ন সৃষ্টি হয় না। বজায় থাকে স্থিতাবস্থা। অক্ষুণ্ণ থাকে প্রতাপের ধ্বজা। শুধু এই সভ্য সমাজের বুকে যেন একটি প্রশ্নচিহ্নের মতো দাঁড়িয়ে থাকে আশির দশক। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়। ক্রমাগত কশাঘাত করে যায় আমাদের চেতনায়। নাড়িয়ে দেয় ঔপন্যাসিকেরও ভাবনাবিশ্বকে। নাড়িয়ে দেয় আমাদের চিন্তাবিশ্বকেও। আর এই সমাজ ও সময়ের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে ভাবতে অবাক লাগে, কিছু সংখ্যক মানুষ 'অচ্ছুৎ' বলে ভাত খেতে পায় না! এবং যেদিন খেতে পায়, সেদিন প্রায় উৎসবের মেজাজ বয়ে যায় সবার মধ্যে। ভাত খাওয়াটা এদের কাছে একটা স্বপ্ন! অথচ, এদের 'অচ্ছুৎ' বানিয়েছে সমাজপতিরাই। নিজেদের স্বার্থরক্ষার খাতিরে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরেই চলতে থাকে শোষণের চাকা। ক্ষুধার আঘাতে জর্জরিত অন্তহীন দিনরাত্রি ধানোয়ার'দের জীবন থেকে মুছে যেতে পারে না। তাই শেষ হয় না খাদ্যের অন্বেষণে জীবনভর হন্যে হয়ে ঘোরাও।

কিন্তু, জীবন তো স্বভাবতই দ্বিবাচনিক। জীবনে কোনো বিষয়েরই একক উপস্থিতি সম্ভব নয়। এই সর্বগ্রাসী প্রতাপের ঘন তমসার বিপরীতেও তাই স্ফুরণ ঘটে মানবতাবোধের। স্পন্দিত হয় জীবন। অভুক্ত, লাঞ্ছিত ধানোয়ার বা রামনৌসেরাদের কেউই গর্জে উঠতে পারে না এই অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে, শূন্য হাতে জমিমালিকদের করুণার উপর তাদের বেঁচে থাকতে হয় বটে; কিন্তু এই বিশাল শূন্যতা ও অনিশ্চয়তাকে অস্বীকার করে, কুয়াশাচ্ছন্ন হিমের রাতের নৈঃশব্দকে চিরে ভেসে আসে রামনৌসেরার হৃদয় থেকে উৎসারিত এক ঝাঁক সুরের পাখি। হাভাতেদের সংগ্রামক্লান্ত, ক্ষুধার্ত জীবনের কয়েকটি মুহূর্ত যেন এক অপার শান্তির প্রলেপে স্নিগ্ধ হয়ে যায় শিল্পীমনের ঐশ্বর্যময় মূর্চ্ছনার স্পর্শে। (প্রসঙ্গত, রামনৌসেরার আগে গান গাওয়ার অভ্যাস ছিল। সে নাটকের দলের গাইয়ে ছিল। কিন্তু খাদ্যের সন্ধানে এবং অসুস্থতার কারণে তাকে দুটোই ছাড়তে হয়।) এছাড়া, ধানক্ষেতের পাশে অপেক্ষারত অবস্থায় অন্য হাভাতের দলের লোকজনদের আসতে দেখে প্রথমটা ধানোয়ার'রা কেউ খুশি হয় না। কিন্তু রামনৌসেরা জানে এরাও তাদেরই মতো ক্ষুধার অন্ন সংস্থানেই পথে বেরিয়েছে। পরম আতিথেয়তায় সে তাদের বসতে বলে এবং সবার সাথে আলোচনা করে খাদ্যসমস্যার সুরাহার জন্য ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে যাওয়ার সহজ সমাধানসূত্র বের করে। মিখায়েল বাখতিনের দ্বিবাচনিকতার তত্ত্বকে অনুসরণ করে আমরা তাই বলতে পারি,

> "…self / other is a relation of simultaneity." [১৩]

এই স্বতঃস্ফূর্ত ও নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়াকেই অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটে উঠতে দেখি লছমন চরিত্রটির মধ্যে। তারই গ্রামের অসহায়, পঙ্গু, দুঃখী মেয়ে ছনেরিকে, হাঁটতে পারে না বলে কাঁধে করে সাতদিনের পথ হেঁটে সে এখানে নিয়ে আসে। পরবর্তীতে খাদ্যের খোঁজে জঙ্গালে পরসাদীকে বাঁচাতে গিয়ে বাঘের মুখে প্রাণ হারায় লছমন। আবার, কখনও দেখা যায়, রাস্তার পাশে থাকার জায়গা নিয়ে ধানোয়ারদের দলের সঙ্গে 'সপেরা' (সাপুড়ে) জগলালদের দলের লোকেদের মধ্যে তুমুল ঝগড়া হয়ে গেলেও মাত্র কয়েকঘন্টার মধ্যেই সমস্যার মুখে একে অপরের প্রতি নির্দ্বিধায় সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেয়।

প্রতাপের উদ্ধত দৃষ্টির সম্মুখে হয়তো ধানোয়ার, মুনোয়ারপ্রসাদ, সাগিয়া, রামনৌসেরা, লছমন, পরসাদী, লাখপতিয়া'দের কোনই মানবিক অস্তিত্ব নেই। কিন্তু, সত্য এটাই যে, মনুষ্যত্ব বিচারে প্রতাপ নির্ধারিত মানদন্ডেরও কোনো মূল্য নেই। মানবতাবোধ চিরকালই শাসকের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে প্রসারিত হয়ে গেছে ব্যক্তিগত স্তর থেকে বিশ্বজনীন স্তরে এবং গড়ে তুলেছে এক বিশাল দ্বিবাচনিক পটভূমি। এই দ্বিবাচনিকতার সূত্র ধরেই দেখব, আশির দশকের প্রবল সামন্ততান্ত্রিক সমাজের আঁধারঘন পটভূমিতে দাঁড়িয়ে সেই আঁধারের আবরণকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিতে না পারলেও, ধানোয়ার-লাখপতিয়াদের মতো অচ্ছুৎ, নিম্নশ্রেণীর, দরিদ্র, হাভাতে, প্রান্তকায়িত স্তরের মানুষদের মধ্যে রচিত হয় এক পারস্পরিক সহানুভূতি ও স্নেহের পরিমন্ডল। উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদে তাই দেখি, অন্য সকলের সঙ্গে সারাদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমে যে ধান সংগ্রহ করে ধানোয়ার, সন্ধ্যায় সেই নতুন চালের ভাত রান্না করে খেতে যাবার আগে ক্ষুধার্ত ছনেরির অসহায় মুখ দেখে নির্দ্বিধায় নিজের খাদ্য তুলে দেয় ছনেরির মুখে। আর নিজে কয়েকটা পাকা কুল খেয়েই ক্ষুধা নিবারণ করে। অন্যদিকে লাখপতিয়াও তার বৃদ্ধা শাশুড়িকে পেট ভরে ভাত খাওয়ায় এবং নিজে অভুক্তই থেকে যায়। বরং বৃদ্ধা শাশুড়িকে ভাল করে ভাত খাওয়াতে পারল বলে আনন্দে সে বলে 'কত কাল পর তোকে ভাত খাওয়াতে পারলাম। হো ভগোয়ান' (পৃঃ ৮৮)।

ধানোয়ার, লাখপতিয়া — উভয়েই অপেক্ষা করে ঝলমলে আগামী দিনের। সেদিন তারা ভাত খাবে!

আসলে ধানোয়ার'দের এই লড়াই কিছু সময়ের জন্য নয়, জীবনব্যাপী লড়াই। প্রতাপের লৌহস্তম্ভের নিচে পিষে পিষে শেষ হয়ে যায় তাদের জীবন। খাদ্যের জন্য বা একটু অন্যভাবে ঘুরিয়ে বললে, বেঁচে থাকার জন্য এরা লড়াই করে শুধু জমিমালিকের সঙ্গেই নয়; সাপের সঙ্গে, চিতার সঙ্গে। কিন্তু এইভাবেই তারা জানান দিয়ে যায় তাদের অস্তিত্বের কথাও। প্রতাপের জাল সহজে ছিঁড়ে না বটে, কিন্তু এর বিপরীতে দাঁড়িয়ে এই জাল ছিন্ন করে বেরিয়ে আসার সংগ্রামও থামে না কখনও। চরৈবেতির অমোঘ ঋকমন্ত্রে এগিয়ে চলে তাদের জীবন।

<u>উল্লেখসূত্র:</u>

(১) 'নিম্নবর্গের ইতিহাস', সম্পাদনা — গৌতম ভদ্র, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা- ০৯, চতুর্থ মুদ্রণ- ২০০৪ পৃঃ ৩।
(২) 'শুভশ্রী' পত্রিকা, তদেব, পৃঃ ২১ ।
(৩) 'শুভশ্রী' পত্রিকা, নিম্নবর্গের মানুষ বাংলা কথাসাহিত্যে, ৪৫ বর্ষ, মুর্শিদাবাদ- ০৩, ২০০৬-০৭, পৃঃ ২১ ।
(৪)'আড়কাঠি', ভগীরথ মিশ্র, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭৩, প্রথম প্রকাশ- ১৯৯৩, পৃঃ ১৮-১৯ ।
(৫)'Dalits in Action', A. K. Lal, Concept Publishing Company, New Delhi- 59, First Published- 1997, page no. 18 .

(৬) 'বাংলা কবিতা সমুচ্চয়', রথীন ভৌমিক : 'শব্দাবলী' কবিতা, পৃঃ ১৯১ ।
(৭) 'পদমর্যাদা : মূল্যায়ণ ও ক্রমোচ্চ বিন্যাস', আন্দ্রে বেতেই (অনুবাদ — অভিজিৎ দাশগুপ্ত, জাতি বর্ণ ও বাঙালি সমাজ), সম্পাদনা- শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিজিৎ দাশগুপ্ত, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা-০৬, প্রথম প্রকাশ- ১৯৯৮, পৃঃ ৫৪ ।
(৮) 'স্বাধীনতা উত্তর বাংলা উপন্যাসে নিম্নবর্গের অবস্থান', রুমা বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ- ২০০৫, পৃঃ ২৫-২৬ ।
(৯) 'স্বাধীনতা উত্তর বাংলা উপন্যাসে নিম্নবর্গের অবস্থান', তদেব, পৃঃ ৩১ ।
(১০) 'উপন্যাসের সময়', তপোধীর ভট্টাচার্য, এবং মুশায়েরা, কলকাতা- ৯০, প্রথম প্রকাশ- ১৯৯৯, পৃঃ ৩২ ।
(১১) 'কবিতা সংগ্রহ ২', শঙ্খ ঘোষ, 'পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ' কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭৩, প্রথম প্রকাশ- ১৩৯৭, পৃঃ ১৯ ।
(১২)'Land and Society in India: Agrarian Relations In Colonial North Bihar', Bindeshwar Ram, Orient Longman Limited, Chennai- 600002, First Publish- 1997, page no.11 .
(১৩) 'Dialogism: Bakhtin and his World', Ibid, page no.19.

****